ARTICLE 19

সার্বিক সহযোগিতায়

British High Commission
Dhaka

রাবাত কর্মপরিকল্পনা

জাতি সংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) কর্তৃক আয়োজিত চারটি আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় প্রাপ্ত এবং ২০১২সালে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জাতিগত, গোত্রীয়এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ।

আর্টিকেল ১৯ কর্তৃক অনুদিত

রাবাত কর্মপরিকল্পনা

জাতি সংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) কর্তৃক আয়োজিত চারটি আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় প্রাপ্ত এবং ২০১২সালে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জাতিগত, গোত্রীয়এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ।

আর্টিকেল ১৯ কর্তৃক অনুদিত

সার্বিক সহযোগিতায়

British High Commission
Dhaka

জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক রাবাত কর্মপরিকল্পনা[১]

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) কর্তৃক আয়োজিত চারটি আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় প্রাপ্ত এবং ২০১২ সালে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ

ক. ভূমিকা

১. জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কর্মশালার আয়োজন করে। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন আঞ্চলিক বাস্তবতার ওপর আলোকপাত করেন এবং বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলার আইনী পদক্ষেপসহ অন্যবিধ নানা কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

২. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (ব্যাংকক, ৬-৭ জুলাই ২০১১) ছাড়াও ইউরোপ (ভিয়েনা, ৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১), আফ্রিকা (নাইরোবি, ৬-৭ এপ্রিল ২০১১), এবং আমেরিকা (চিলির সান্তিয়াগো, ১২-১৩ অক্টোবর ২০১১) মহাদেশে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।[২] এসব কর্মশালা আয়োজনে OHCHR'র উদ্দেশ্য ছিল– জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণার ব্যাপারে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের আইন, আইনি দর্শন (jurisprudence) ও নীতিসমূহের একটি পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করা। এই কার্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার সম্পর্ক/সীমারেখার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে

ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও সহিংসতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সম্পর্ক/সীমারেখার বিষয়টিই সামনে চলে আসছে।

৩. ২০১১ সালে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত চারটি বিশেষজ্ঞ কর্মশালা প্রচুর তথ্যের যোগান দেয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক প্রাসঙ্গিক মান/বিধান বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু বাস্তবধর্মী সুপারিশ উপস্থাপন করে।[৩] এসব তথ্য ও সুপারিশসহ চারটি কর্মশালার ফলাফল সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য কার্যপদ্ধতি/কর্মকৌশল চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, OHCHR ২০১২ সালে সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ কর্মশালার (রাবাত, ৪-৫ অক্টোবর ২০১২) আয়োজন করে।

৪. রাবাতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় চারজন সঞ্চালকসহ আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ অংশ নেন। এদের মধ্যে ছিলেন জাতিসংঘের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, বর্ণবাদ, বর্ণ-বৈষম্য, বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা (xenophobia) ও অসহিষ্ণুতা বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, বর্ণ-বৈষম্য বিলোপ কমিটি এবং বেসরকারি সংস্থা আর্টিকেল ১৯ এর একজন করে প্রতিনিধি।

৫. পূর্ববর্তী কর্মশালাগুলোর মতো রাবাত কর্মশালাতেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের প্রতিনিধিদলে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হয়। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ফান্ড ও প্রোগ্রামসহ এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনের (যেমন, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং ধর্ম/বিশ্বাস-নির্ভর সংগঠন) জন্যও পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়।

৬. অত্র দলিলটি রাবাত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ প্রতিফলিত করে।

খ. প্রেক্ষাপট

৭. বর্তমান বিশ্বে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সমাজ অনেক বেশি বহুসাংস্কৃতিক সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা বিদ্বেষমূলক প্রচারণার সমস্যাকে নতুনভাবে আলোচনায় এনেছে। অবশ্য একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, অতীতের অনেক সংঘাত-সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও জাতিগত, গোত্রীয় বা ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক প্রচারণার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

৮. সকল ধরনের মানবাধিকারই সার্বজনীন, অবিভাজ্য এবং পারস্পরিক-নির্ভরশীল। পারস্পরিক-নির্ভরশীলতার দিকটি সবচেয়ে দৃশ্যমানভাবে প্রতিভাত হয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে অন্যান্য মানবাধিকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সুরক্ষা দেয় এবং এর মাধ্যমে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পন্দমান ও বহুমুখী বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করে। গণতন্ত্র ও টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নয়নে মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

৯. বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী দুর্ভাগ্যবশত কেবলমাত্র তাদের জাতীয়তা বা ধর্ম-বিশ্বাসের কারণে নানাবিধ বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতার শিকার হয়। এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা নির্বাচনী স্বার্থে প্রায়শই বর্ণ, জাতীয়তা এবং ধর্মের অপব্যবহার করা হয় এবং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় পরিচিতির ধারণাকে বিপজ্জনকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ জাতীয় সমস্যার মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরি।

১০. মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার একটি দ্বান্দ্বিক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ, সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রায়শই দাবি করা হয়। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হল, এই দুই ধরনের স্বাধীনতা কেবল পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীলই নয়, বরং তারা পরস্পর পরস্পরকে শক্তিমান করে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একইভাবে ধর্মীয় বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ

তৈরিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিকল্প নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের মৌলিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গতি বা বিকৃতি অনুসন্ধানের স্বার্থে বাধাহীন বিতর্কে মুক্ত ও সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি।

১১. এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির (ICCPR) অনুচ্ছেদ ২০-এর শর্ত পূরণের পরও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার অনেক ঘটনা কখনই বিচার বা শাস্তির আওতায় আসে না। পক্ষান্তরে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিনিয়ত অস্পষ্ট দেশীয় আইন, আইনি ব্যাখ্যা ও বিদ্যমান নীতির অপপ্রয়োগের কারণে বিচারের সম্মুখীন হয়, যা অন্যদেরকেও সন্ত্রস্ত করে তোলে। (১) *বিদ্বেষমূলক প্রচারণার প্রকৃত ঘটনা বিচারের আওতায় না আসা এবং (২) দেশীয় আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ওপর আইনি নিপীড়নের* এ জাতীয় সাংঘর্ষিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান। বিভিন্ন দেশের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বিরোধী আইনে ব্যাপক মাত্রার ভিন্নতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এসব আইন অত্যধিক সংকীর্ণ কিংবা অস্পষ্ট এবং আইনের ব্যাখ্যা (jurisprudence) অপ্রতুল ও নীতি-সাপেক্ষ নয়, বরং ঘটনা-সাপেক্ষ। অনেক রাষ্ট্র যদিও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো একটি বিস্তৃত পরিসরের জন্য প্রযোজ্য। প্রকৃত বাস্তবতা নিরূপণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এসব নীতি-কৌশল ততটা কার্যকর নয়।

১২. সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক পর্যায়ের চারটি কর্মশালা এবং তারই ধারাবাহিকতায় রাবাতে অনুষ্ঠিত কর্মশালা তাই একটি সময়োচিত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

গ. বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত নীতির বাস্তবায়ন

১৩. উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ, স্বচ্ছ ও গভীর চিন্তা ও আলোচনার প্রতিফলন। আইন, বিচারিক পরিকাঠামো এবং নীতি-কৌশল বিষয়ে প্রদত্ত এসব সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের মূল লক্ষ্য হল জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণা নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

অ. আইন প্রণয়ন

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১৪. মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড দেশীয় আইন প্রণয়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। উক্ত মানদণ্ড অনুযায়ী, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির (ICCPR) অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯-এর আওতায় অন্যের অধিকারের সুরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন যুক্তিতে "ঘৃণা উদ্দীপক বক্তব্য" (hate speech) নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্যদিকে, জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী "বিদ্বেষমূলক প্রচারণা" নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে (ICCPR এর ২০.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে; এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ICERD এর ৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে)।

১৫. বিভিন্ন কর্মশালায় যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল পৃথিবীর অনেক দেশেই বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন নেই। উপরন্তু, অনেক দেশের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বিরোধী আইনে ব্যবহৃত ভাষা ও প্রত্যয় ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিদ্বেষমূলক প্রচারণার সংজ্ঞা যত বিস্তৃত হয়, এসব আইনের অপব্যবহারের সুযোগও তত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের অপরাধ সংক্রান্ত আইনে ব্যবহৃত ভাষা ও প্রত্যয়ে ব্যাপক মাত্রার ভিন্নতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আইনের অস্পষ্ট (vague) ভাষার কারণে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর অযাচিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এরূপ অবস্থা ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে এবং ICCPR এর ১৯ অনুচ্ছেদের বাইরে গিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকে অনায্য বৈধতা দেয়।

১৬. কিছু দেশের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা সংক্রান্ত আইনে কেবলমাত্র গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার কিছু দেশের আইন কেবলমাত্র গোত্রীয় বিদ্বেষকে নিষিদ্ধকরণের আওতায় এনেছে। অন্যদিকে, কিছু দেশ অন্যবিধ অনেক বিদ্বেষকেও নিষিদ্ধ করেছে। অনেক দেশে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা একটি ফৌজদারী অপরাধ, অনেক দেশে এটি

কেবলমাত্র দেওয়ানী অপরাধ, আবার অনেক দেশে এটি একইসঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধ।

১৭. আন্তর্জাতিক আইনে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি ICCPR এর ২০ এবং ICERD এর ৪ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। ICCPR এর অধীনে গঠিত মানবাধিকার কমিটি তাদের 'সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪' এ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, "ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রেক্ষাপট বিদ্যমান না থাকলে, কোন ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব প্রদর্শনকে নিষিদ্ধকরণ, কিংবা ব্লাসফেমি আইনের ব্যবহার ICCPR এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এরূপ যে কোন নিষেধাজ্ঞাকে অবশ্যই অনুচ্ছেদ ১৯(৩) এর শর্তাবলী পূরণ করতে হবে এবং অনুচ্ছেদ ২, ৫, ১৭, ১৮ ও ২৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এ জাতীয় আইনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন এক বা একাধিক ধর্ম বা বিশ্বাসব্যবস্থা কিংবা উহার অনুসারীদের অনুকূলে বৈষম্য করা যাবে না কিংবা অন্যান্য ধর্ম বা বিশ্বাসব্যবস্থা, উহাদের অনুসারী কিংবা অবিশ্বাসীদের ওপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। একইভাবে, ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা, মতবাদ বা মূলনীতির সমালোচনাকে নিষিদ্ধকরণ কিংবা শাস্তির আওতায় আনা যাবে না।"

১৮. যেহেতু মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপই মৌলিক বিচারে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ, তাই ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবার প্রয়োজনীয় প্রান্তিক মান (threshold) অত্যন্ত কঠোর। উক্ত প্রান্তিক মান অনুধাবনে আমাদেরকে ICCPR এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করতে হবে। উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের তিন স্তর বিশিষ্ট শর্তাবলী (বৈধতা, সামঞ্জস্যতা ও অপরিহার্যতা) বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় যে কোন বিধি-নিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত করা জরুরি যে, উক্ত বিধি-নিষেধ আইনের দ্বারা আরোপিত, সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রণীত, এবং উক্ত উদ্দেশ্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিধি-নিষেধ সুস্পষ্টভাবে ও সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত হবে, অতীব জরুরি কোন সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য আরোপিত হবে, যথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণমূলক হবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাছ-বিচারহীন নিয়ন্ত্রণ

আরোপের সুযোগ তৈরি করবে না, এবং মত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি আরোপের কুফল বিবেচনায় বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অর্জিত সুফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

১৯. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্লাসফেমি আইনের ব্যবহার হিতে বিপরীত ফল দেয়। কারণ, এর মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয়/আন্তঃবিশ্বাস কিংবা আন্তঃধর্মীয়/আন্তঃবিশ্বাস গঠনমূলক, স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সংলাপ, বিতর্ক বা সমালোচনার সুযোগ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, ব্লাসফেমি আইন অনেক ক্ষেত্রেই কেবল বিশেষ এক বা একাধিক ধর্মকে সুরক্ষা দেয় এবং কার্যক্ষেত্রে বৈষম্যমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ধর্মীয় অপরাধ বিষয়ক আইন প্রয়োগের কারণে কিংবা ধর্মীয় অপরাধ নির্দেশ করে না এরূপ অনেক আইনের অতি উৎসাহী প্রয়োগের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভিন্নমতাবলম্বী, নাস্তিক এবং অবিশ্বাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই আইনী নিপীড়নের শিকার হন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সমালোচনা বা উপহাস থেকে মুক্ত কোন ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ বা লালনের নিশ্চয়তা দেয় না।

সুপারিশসমূহঃ

- মত প্রকাশের ক্ষেত্রে তিন ধরনের অভিব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। প্রথমত, কিছু অভিব্যক্তি ফৌজদারী অপরাধের আওতায় পড়ে। দ্বিতীয়ত, কিছু অভিব্যক্তি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য নয়, কিন্তু এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, কিছু অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী, দেওয়ানী বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ সঙ্গত নয়, কিন্তু তা সহনশীলতা, সভ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের নীতির পরিপন্থী।

- ICCPR এর ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্রকে ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদের ("জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণা") সুস্পষ্ট বরাত দিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা সংক্রান্ত দেশীয় আইন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং 'ঘৃণা',

'বৈষম্য', 'বৈরিতা' বা 'সহিংসতা'র মত মূল পরিভাষাসমূহ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সমতা বিষয়ক ক্যামডেন নীতিমালার (ক্যামডেন নীতিমালা) সহায়তা নেয়া যেতে পারে।[৪-৫]

- মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের তিন স্তর বিশিষ্ট শর্তাবলী (বৈধতা, সামঞ্জস্যতা ও অপরিহার্যতা) যেন বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, রাষ্ট্রকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

- রাষ্ট্রকে ICCPR এর অধীনে গঠিত মানবাধিকার কমিটি, উক্ত কমিটির 'সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪', ICERD এর অধীনে গঠিত বর্ণ-বৈষম্য নিরসন কমিটি (CERD), উক্ত কমিটির 'সাধারণ সুপারিশ নং ১৫', মানবাধিকার কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (special procedures mandate holders) সহ মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার (international human rights expert mechanisms) দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

- এটি প্রত্যাশিত যে, রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিলসমূহ অনুসমর্থন এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবে, উক্ত দলিলসমূহের আপত্তি (reservations) তুলে নেবে এবং উক্ত দলিলসমূহের শর্ত মোতাবেক প্রতিবেদন দেয়ার বাধ্যবাধকতাকে যথাযথভাবে সম্মান জানাবে।

- ব্লাসফেমি আইন থাকলে রাষ্ট্রকে তা রহিত করতে হবে। কারণ, এরূপ আইন ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে এবং ধর্ম সম্পর্কে গঠনমূলক সংলাপ ও বিতর্কের সুযোগ রুদ্ধ করে।

- রাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গ বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইনে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক এবং শাস্তিমূলক কার্যকর ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে।

আ. আইনের ব্যাখ্যা (Jurisprudence)

সিদ্ধান্তসমূহঃ

২০. যে কোন ঘটনার তথ্যাদি ও আইনি সংশ্লেষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সাথে সঙ্গতি রেখে বিচারিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, যার সদস্যরা আন্তর্জাতিক আইনের হালনাগাদ বিধান ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ। এতদসঙ্গে প্যারিস মূলনীতির (the Paris Principles) আলোকে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসহ ক্ষমতার পরীক্ষা ও ভারসাম্য (checks and balances) রক্ষাকারী অন্যান্য ব্যবস্থার কার্যকারিতাও অত্যন্ত জরুরি।

২১. বিদ্বেষমূলক প্রচারণার খুব কম ঘটনাই বিচারিক বা আধা-বিচারিক প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনগ্রসর বা অরক্ষিত গোষ্ঠীর সদস্য। অন্যদিকে, বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে বিচারিক নজির (case law) সারা বিশ্বেই যথেষ্ট অপ্রতুল। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ঘটনায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অনগ্রসর বা অরক্ষিত গোষ্ঠীর সদস্যরা পর্যাপ্ত আইনি বা বিচারিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিচারিক নজিরের অপ্রতুলতার সম্ভাব্য কারণের মধ্যে রয়েছে প্রবেশগম্য আর্কাইভের অনুপস্থিতি, বিচার-প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হবার ব্যাপারে সাধারণ জনগণের সচেতনতার অভাব এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রতি আস্থার সঙ্কট।

২২. মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বিদ্বেষমূলক প্রচারণার সংজ্ঞায়ন এবং ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর প্রান্তিক মান (threshold) অনুসরণে প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রান্তিক মানের মূল ভিত্তি হল তীব্রতা (severity); তাই, বিদ্বেষমূলক প্রচারণার যে কোন অপরাধে অবশ্যই গুরুতর ও তীব্র ঘৃণার উপাদান থাকতে হবে। ঘৃণার গুরুত্ব ও তীব্রতা মূল্যায়নে বক্তব্যের নিষ্ঠুরতা, ক্ষতি সাধনের উস্কানি, এবং প্রচারণার পরিমাণ, পুনরাবৃত্তি ও ব্যাপ্তিকে বিবেচনায় নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে, ফৌজদারী অপরাধের আওতাধীন অভিব্যক্তি/প্রচারণা চিহ্নিতকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত ছয় স্তর বিশিষ্ট প্রান্তিক মানের প্রস্তাব করা হয়:

- **প্রেক্ষাপটঃ** কোন বক্তব্য একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য বৈষম্য, বৈরিতা বা সহিংসতার সম্ভাবনা তৈরি করে কিনা, তা নির্ধারণে উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া অত্যন্ত জরুরি। বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ নিরূপণেও প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় বক্তব্যটি দেয়া হয়েছে বা প্রচারিত হয়েছে, তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

- **বক্তাঃ** সমাজে বক্তার অবস্থান এবং মর্যাদার বিষয়টি, বিশেষত যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যটি দেয়া হয়েছে তাদের ওপর ওই বক্তা বা তার সংগঠনের প্রভাব, গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

- **উদ্দেশ্যঃ** ICCPR এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিদ্বেষমূলক যে কোন প্রচারণা উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। নিছক অসতর্ক বা বেপরোয়া প্রচারণা ২০ অনুচ্ছেদের আওতায় আসবে না; কারণ, অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য হবার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা এবং বিদ্বেষ উদ্রেক আবশ্যক। শুধুমাত্র বক্তব্যের প্রচার বা প্রসার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য নিরূপণের জন্য বক্তব্যের বিষয়গত ও বিষয়গত দিক (object and subject of the speech) এবং শ্রোতা/পাঠকের মধ্যকার ত্রিমাত্রিক সম্পর্ককে বিবেচনায় নিতে হবে।

- **বিষয়বস্তু বা ধরনঃ** বক্তব্যের বিষয়বস্তু আদালতের বিবেচনার অন্যতম মূল বিষয় এবং এটি বিদ্বেষমূলক যে কোন প্রচারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বক্তব্যটি কি মাত্রায় উস্কানিমূলক ও দ্ব্যর্থহীন, বক্তব্যের প্রস্তাবনার ধরণ, রীতি ও প্রকৃতি কেমন এবং প্রস্তাবনায় কতটুকু ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, সে সকল বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত।

- **প্রচারণার ব্যাপ্তিঃ** প্রচারণার ব্যাপ্তি বলতে মূলতঃ বক্তব্যের বিস্তৃতি, গণচরিত্র, গুরুত্ব এবং শ্রোতা/পাঠকের সংখ্যা বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আরও যে বিষয়গুলো বিবেচ্য, তার মধ্যে রয়েছে– তর্কিত বক্তব্যটি প্রকাশ্য কিনা; প্রচারণার জন্য কোন

মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ– এটি কি কেবল একটি লিফলেটের মাধ্যমে নাকি মূলধারার গণমাধ্যম বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচারিত); প্রচারণার পরিমাণ, পুনরাবৃত্তি ও পরিসর কতটুকু; যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যটি দেয়া হয়েছে, বক্তব্য অনুসারে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা আছে কিনা; এবং বক্তব্যটি (বা, শিল্পকর্মটি) কি একটা সীমাবদ্ধ পরিবেশে প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছিল নাকি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

- **সম্ভাব্যতা বা অত্যাসন্নতাঃ** বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মূলতঃ একটা অপরিণত (inchoate) অপরাধ। এরূপ যে কোন প্রচারণা শাস্তিযোগ্য হবার ক্ষেত্রে উক্ত প্রচারণায় যে কাজের উস্কানি দেয়া হয় সে কাজ সংঘঠিত হওয়া আবশ্যক নয়। এতদসত্ত্বেও, বিদ্বেষমূলক প্রচারণারক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতির বাস্তবসম্মত ঝুঁকি থাকতে হবে। আদালতকে তাই এই মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, তর্কিত প্রচারণাটিতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য বৈষম্য, বৈরিতা বা সহিংসতার বাস্তবসম্মত ঝুঁকির উপাদান রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচারণা ও ক্ষতির কার্যকারণ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হতে হবে।

সুপারিশসমূহঃ

- দেশীয় ও আঞ্চলিক আদালতসমূহকে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও তুলনামূলক আইনি ব্যাখ্যার হালনাগাদ অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে হবে। কারণ, এ জাতীয় অপরাধ বিচারের সময় আদালতকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক মান (threshold) অনুসরণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া নীতি ও ব্যাখ্যা বিবেচনায় নিয়ে এক ধরণের সার্বিক মূল্যায়নের আশ্রয় নিতে হবে।

- রাষ্ট্রকে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য শুনানীর মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- আইনি বা অন্যবিধ সহযোগিতার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

- বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যেন দেওয়ানী মামলা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণসহ কার্যকর প্রতিকার পেতে পারেন, রাষ্ট্রকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

- বেআইনি অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইনের ব্যবহার একটি সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট গুরুতর/মারাত্মক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। আর্থিক ও অআর্থিক ক্ষতিপূরণ, তর্কিত অভিব্যক্তির সংশোধন দাবীর অধিকার বা প্রত্যুত্তর দেবার অধিকারসহ দেওয়ানী আইনে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিকার বিধানের বিষয়টিও বিবেচনার দাবী রাখে। বিভিন্ন পেশাজীবী বা নিয়ন্ত্রক সংগঠন যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা প্রতিকার বিধান করে, বেআইনি অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেও সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বা প্রতিকার বিধান করা যায়।

ই. নীতি-কৌশল (Policies)

সিদ্ধান্তসমূহঃ

২৩. বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলায় আইনি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বরং, বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলার বহুমুখী ব্যবস্থার মধ্যে এটি একটি ব্যবস্থা মাত্র। অন্যদিকে, আইনি পদক্ষেপের যথাযথ কার্যকারিতার স্বার্থেই সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্পূরক উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। এসব উদ্যোগের লক্ষ্য হবে সামাজিক সচেতনতা, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন বা উন্মুক্ত আলোচনার সহায়ক নীতি-কৌশল, পদ্ধতি বা ব্যবস্থার বৈচিত্র্যকে লালন-

পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান। এর মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিচারকদের মধ্যে শান্তি, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং গণমাধ্যম ও ধর্মীয়/আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের নৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সাপেক্ষে এরূপ প্রচারণার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা মূলত রাষ্ট্র, গণমাধ্যম ও সমাজের একটি যৌথ দায়িত্ব।

২৪. রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী অসহিষ্ণু বার্তা ও অভিব্যক্তি পরিহার করতে হবে। উপরন্তু, তাদেরকে অসহিষ্ণুতা, বৈষম্যমূলক গৎবাঁধা ধারণা (stereotyping) ও ঘৃণা উদ্দীপক বক্তব্যের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে হবে যে, বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিপরীতে সহিংসতার আশ্রয় নেয়া কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২৫. অসহিষ্ণুতার মূলোৎপাটনে বিস্তৃত পরিসরের জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতি-কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় ও পারস্পরিক সংলাপের বিকাশ, শিক্ষাব্যবস্থায় বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা এবং সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বার্থে এমন সব নীতি-কৌশল গ্রহণ করা যাতে উক্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়।

২৬. সংখ্যালঘুরা যেন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গণমাধ্যম নিবন্ধন ও পরিচালনার কাজটি সহজতর করা। বহুমুখী তথ্য ও মতামত প্রচার ও প্রাপ্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সুস্থ সংলাপ ও বিতর্কের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২৭. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলায় আইনি ব্যবস্থার চেয়েও অন্যবিধ নানা পদক্ষেপকে অধিকতর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে কার্যকর রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন এবং সত্য ও সমঝোতা কমিশন (truth and reconciliation commissions) সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রক্রিয়ার প্রচলন। আঞ্চলিক মানবাধিকার

ব্যবস্থা, বিশেষায়িত বিভিন্ন সংস্থা, সক্রিয় সুশীল সমাজ (civil society) এবং স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার নীতি ও মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইতিবাচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের লালন ও বিকাশ বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

২৮. মুক্ত পরিবেশে মত প্রকাশ ও সমতার অধিকার নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা মৌলিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ধারার গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, প্রচলিত ধারার গণমাধ্যম বর্তমানে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল সম্প্রচার, মোবাইল টেলিফোনি, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নতুন ধারার প্রযুক্তিগুলো তথ্যের প্রচারের ক্ষেত্রকে ব্যাপক মাত্রায় বিস্তৃত করেছে এবং ব্লগসহ পারস্পরিক যোগাযোগের নিত্য নতুন মাধ্যমের জন্ম দিয়েছে।

২৯. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ বিদ্বেষমূলক প্রচারণা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এক্ষেত্রে "ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে কোন ব্যক্তির প্রতি অসহিষ্ণুতা, নেতিবাচক গৎবাঁধা ধারণা-পোষণ, কালিমালেপন, বৈষম্য, সহিংসতা এবং সহিংসতার উস্কানি মোকাবেলা" ("Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief) শীর্ষক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ১৬/১৮ নং সিদ্ধান্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিনা ভোটে গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে "রাবাত কর্মপরিকল্পনা"সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সার্বক্ষণিক তদারকির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

রাষ্ট্রের প্রতি সুপারিশসমূহঃ

- জাতি, গোত্র, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক গৎবাঁধা ধারণা-পোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ মোকাবেলায় বড় ধরনের যে কোন উদ্যোগে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা উচিত।

- লিঙ্গ সংবেদনশীলতাসহ আন্তঃসাংস্কৃতিক সমঝোতার উন্নয়নে রাষ্ট্রকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। উপরন্তু, শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রতিটি রাষ্ট্রই দায়বদ্ধ।

- রাষ্ট্রকে সকল বয়সী ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুল কারিকুলামে আন্তঃসাংস্কৃতিক সমঝোতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তি বা শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের মূল্যবোধ ও মূলনীতির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে নিরাপত্তা বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য এবং বিচারিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও সংবেদনশীলতার উন্নয়নে রাষ্ট্রের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা উচিত।

- অধিকতর দক্ষতার সাথে সামাজিক সংলাপ জোরদার করা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নেয়ার উদ্দেশ্যে সমতা বিষয়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা (প্যারিস মূলনীতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত) জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও মানদণ্ড নির্ধারণ এবং স্বীকৃত উত্তম চর্চার অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- রাষ্ট্রকে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় বিদ্বেষমূলক প্রচারণা সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

- নতুন ধারার যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল গণমাধ্যমে বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা এবং যোগাযোগ মাধ্যমে প্রবেশগম্যতা বা যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা নিশ্চিকরণে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও তদারকি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- মানবাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিশেষত রাষ্ট্রের উচিত মানবাধিকার কমিটি, CERD সহ মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন চুক্তির অধীনে গঠিত কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের (special procedures mandate holders) প্রয়োজনীয় সহায়তা করা; কারণ, এসব কমিটি বা বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা মানবাধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের প্রতি সুপারিশসমূহঃ

- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিদ্বেষমূলক প্রচারণা প্রতিরোধ, বৈষম্য বিলোপসহ এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার (international expert mechanisms) প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা যায়। মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন চুক্তির অধীনে গঠিত কমিটি শক্তিশালীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের (special procedures mandate holders) সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ সমর্থন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

- বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত দেশীয় আইন ও নীতি-কাঠামো উন্নয়নে আগ্রহী রাষ্ট্রসমূহের সাথে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) একত্রে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে OHCHR রাবাত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত চারটি বিশেষজ্ঞ কর্মশালা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত স্বীকৃত উত্তম চর্চা ও আদর্শ আইনের উপাদানসমূহ সংকলনসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন সহায়িকা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচারিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে হালনাগাদ অবগতির জন্য OHCHR

নিয়মিতভাবে বিচার বিভাগীয় সংলাপের (judicial colloquia) আয়োজন করতে পারে। এরূপ সংলাপ বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিবর্তনশীল সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচারিক নজিরের প্রগতিশীল উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

- মানবাধিকার বিষয়ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চুক্তির অধীনে গঠিত কমিটি এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের (special procedures mandate holders) মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ক্ষেত্রবিশেষে যৌথ কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে, যাতে করে জাতিগত, গোত্রীয় ও ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী প্রচারণার যে কোন ঘটনায় তারা একই সুরে নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারে।

- মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়, জাতিসংঘের সভ্যতা বিষয়ক জোট (the UN Alliance of Civilisations), গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ পরামর্শকের কার্যালয়সহ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি ঐকতান গড়ে তুলতে পারে ও যৌথ কর্মকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগী হতে পারে।

- (ক) ইউরোপীয় কাউন্সিল (the Council of Europe), ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (the Organisation for Security and Cooperation in Europe), ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন (the Organisation of American States), আফ্রিকান ইউনিয়ন, ASEAN এবং ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (the Organisation of Islamic Cooperation) সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তঃআঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে এবং (খ) এসব সংস্থার সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতা ও তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত।

- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অত্র কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত "রাষ্ট্রের প্রতি সুপারিশসমূহ" বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

অন্যান্য অংশীজনের প্রতি সুপারিশসমূহঃ

- বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের (civil society) উচিত আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃ ধর্মীয় সমঝোতা ও সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করা ও এতদসংক্রান্ত চলমান সকল উদ্যোগকে সমর্থন দেয়া।

- রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের সদস্যদের আচরণ, বিশেষ করে প্রকাশ্য বক্তব্যের, বিষয়ে নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা ও উক্ত মানদণ্ড কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

- গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রণীত আচরণবিধি অনুসরণই সর্বাধিক কার্যকর। ক্যামডেন নীতিমালার ৯ নং নীতি অনুসারে, প্রতিটি গণমাধ্যমের উচিত নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে সনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈষম্য মোকাবেলা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সমঝোতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে:

  - বৈষম্যের ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতার সাথে ঘটনার পটভূমি ও বাস্তব অবস্থা জনগণের নিকট উপস্থাপনে যত্নবান হতে হবে।
  - কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক গৎবাঁধা ধারণা-পোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ গণমাধ্যম কর্তৃক উৎসাহিত হবার বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।
  - গোত্র, ধর্ম, লিঙ্গ ও গোষ্ঠী নির্দেশক যে কোন অপ্রয়োজনীয় প্রত্যয় যা অসহিষ্ণুতার জন্ম দিতে পারে, তা অতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।
  - কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক গৎবাঁধা ধারণা-পোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

- বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করতে হবে এবং এসব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে বলার সুযোগ দিতে হবে ও তাদের কথা শুনতে হবে, যাতে করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রত্যেকের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

৩০. এতদ্ব্যতীত, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বঃপ্রণোদিত আচরণবিধিতে সমতার নীতি প্রতিফলিত হতে হবে এবং এরূপ আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঈ. সর্বশেষ মন্তব্য

৩১. মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে এবং অনেক রাষ্ট্রেও দেশীয় আইনে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও, মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বাস্তব প্রয়োগ ও স্বীকৃতির বিষয়টি বিশ্বব্যাপী সমানভাবে সমদৃত নয়। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই দেশীয় আইন ও নীতিমালায় জাতিগত, গোত্রীয় ও ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসৃত হয় না। এ থেকেই বোঝা যায়, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ধারণা ব্যাখ্যা করা বাস্তবিক অর্থে কষ্টসাধ্য, রাজনৈতিক বিবেচনায় স্পর্শকাতর

৩২. এরূপ প্রেক্ষাপটে উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

টীকা

১ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR) অনুচ্ছেদ ২০ এ বলা হয়েছে, "জাতিগত, গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী যে কোন প্রচারণা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে"। অত্র কর্মপরিকল্পনায় এটিকে "বিদ্বেষমূলক প্রচারণা" হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

২ রাবাত কর্মশালা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত চারটি কর্মশালার বিতর্কে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ৪৫ জন বিশেষজ্ঞ ছাড়াও দুই শতাধিক পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৩ কর্মশালাসমূহে প্রদত্ত হাইকমিশনারের বার্তা, কর্মশালার পটভূমি, বিশেষজ্ঞ মতামত, অংশীজনদের প্রস্তাবনা এবং কার্যবিবরণীর জন্য, দেখুন: www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx

৪ ক্যামডেন নীতিমালা (the Camden Principles on Freedom of Expression and Equality) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সমতার সম্পর্ক বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের আলোচনার ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল ১৯ কর্তৃক প্রণীত একটি নীতিমালা। এই নীতিমালায় আন্তর্জাতিক আইন ও মানের প্রগতিশীল ব্যাখ্যা, অনুসরণীয় রাষ্ট্রীয়বিধি-ব্যবস্থা (যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রচলিত আইন ও আদালতের রায়ে প্রতিফলিত) এবং বিশ্বসম্প্রদায় স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতিসমূহ স্থান পেয়েছে।

৫ ক্যামডেন নীতিমালার ১২ নং নীতি অনুসারে, রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ নির্দেশনা কিংবা প্রামাণিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট করতে হবে যে 'ঘৃণা' বা 'বৈরিতা' বলতে "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কুৎসা, শত্রুতা বা ঘৃণার তীব্র ও অযৌক্তিক আবেগ" বোঝানো হবে; 'প্রচারণা' প্রত্যয়টি "উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা ছড়ানো"কে নির্দেশ করবে; এবং 'বিদ্বেষ' শব্দটির দ্বারা "জাতিগত, গোত্রীয় বা ধর্মীয় কোন গোষ্ঠীর ব্যাপারে এমন কোন বিবৃতি"কে বোঝানো হবে "যা ওই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের জন্য বৈষম্য, বৈরিতা অথবা সহিংসতার অত্যাসন্ন ঝুঁকি তৈরি করে।"